মারাঠা জাতীয় বিকাশ

(সরল কাহিনী)

মারাঠা জাতীয় বিকাশ

(সরল কাহিনী)

সার্ যদুনাথ সরকার এম্. এ., ডি. লিট্.

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৪৩

মূল্য আট আনা

সূচীপত্র

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়	১
শিবাজী	১৩
শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা	২৭
মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী	৩৯

ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর গোখলের রাজত্ব না ধরিয়া, এখানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই দুই জাতির সমন্বয় একটু ভাবিয়া দেখুন। রাজপুতানার পরই মহারাষ্ট্র-ইতিহাস বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রমেশ দত্ত রাজপুত-জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা-জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়া উৎফুল্ল হন। বঙ্গীয় কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

মহারাষ্ট্র জাতি—শয়নে ও যার
শিয়রে তুরঙ্গ, কটিবন্ধে অসি,
যুবরাজ, আজি সে জাতি কোথায় ?

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে কারওয়ার বন্দরে সেই "তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী"-কে দেখিয়াছিলেন, গুজরাতের আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষুধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া "সব ঝুঠা হ্যায়" এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন একটি মারাঠী রাজ্যেই অবশেষ হয়। আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অনুকারিগণ মারাঠা সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। অল্পদিন আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালীর বড় আদর ছিল, যেমন ৩০ বৎসর পূর্বে পঞ্জাবে ছিল।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষে মারাঠা জাতির রাজনৈতিক আবির্ভাব ও শক্তিবিস্তার একটি অতুলনীয় ঘটনা। আমরা সাধারণত শিখ স্বাধীনতা ও মারাঠা শক্তির উদয়কে এক রকম ঘটনা বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী। শিখেরা একটি মাত্র প্রদেশে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের সংগ্রাম মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে হয় নাই, আফগান দুর্‌রাণী রাজের সঙ্গে হয়; এবং শিখ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা

অর্ধ শতাব্দীরও কম সময় স্থায়ী ছিল। অপর পক্ষে, মারাঠা শক্তি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুঝিয়া অবশেষে দিল্লীতে রাজার উপর রাজা হইয়া বসে; এই শক্তির প্রভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করে; আর মারাঠা স্বাধীন রাজত্ব ১৬৬৭ হইতে ১৮১৭ পর্যন্ত ১৫০ বৎসর ব্যাপিয়া জীবিত ছিল। বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে সত্যই গর্ব করিয়াছেন "মারাঠারা তাহাদের বিজয়দুন্দুভি আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বাজাইয়াছিল।" ভারতের অন্তিম উত্তর-পূর্বে বঙ্গ, দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়া পর্যন্ত মারাঠা-শক্তির তেজ অনুভব করিয়াছিল।

তাহা ভিন্ন, আর একটা পার্থক্য আছে। শিখসংগঠন একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মাত্র কাজ, মারাঠা রাষ্ট্র একটি জাতি বা নেশনের সৃষ্টি, ইহা সর্ব ধর্মের, সর্ব জাতের অর্থাৎ বর্ণের মিলনের ফল। আর রাষ্ট্র-নীতি-শাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিলে মারাঠী শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শিখদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের ও অধিক কর্মক্ষম। ফলত শিখেরা যোদ্ধামাত্র ছিল, শাসনকর্তা নহে, কিন্তু মারাঠারা এ উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

কিন্তু যদিও মারাঠাদের উদয় মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির শেষ যুগে মাত্র ঘটিয়াছিল, তথাপি উহারা অখ্যাত নগণ্য নবীন ভূঁইফোড় জাতি নহে। এই জাতির গরিমাময় অতীত ইতিহাস ছিল। সম্ভবত অশোক এবং খরবেলের শিলালেখের রাষ্ট্রি জাতি এই মহারাষ্ট্র-বাসিগণ। তাহার পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রকূট রাজগণ নিজেদের বিখ্যাত রাজ্য স্থাপন করিয়া উত্তর-ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারও পরে, যাদব বংশ মহারাষ্ট্র দেশ ব্যাপিয়া শেষ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, এবং এই বংশ মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হইলেও, ইহার অনেক শাখা নানা স্থানে জমিদারের মত বহুদিন পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকিয়া পূর্বপুরুষদের গৌরব-স্মৃতি

জাগ্রত রাখিয়াছিল। যাদব বংশের এইরূপ একটি শাখায় শিবাজীর মাতা জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যে যাদব এবং বিজয়নগর এই দুইটি স্বাধীন কিন্তু তৎকালে বিধ্বস্ত বিখ্যাত হিন্দুরাজ্যের স্মৃতিই শিবাজীকে স্বাধীন স্বরাজ্য স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করে। বিজয়নগরের প্রভাব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তাহার সহিত শিবাজীর সম্বন্ধ যোজনা করা কঠিন।

যাহা হউক, মারাঠা জাতি ও মারাঠা সরদার—স্বাধীন রাজা না হইলেও—আবহমান কাল হইতে ঐ দেশে ছিল। মারাঠী প্রধানগণ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজা বা সামন্ত পদ-বাচ্য, বহমানী সাম্রাজ্যের সময়ে এবং তৎপরে অহমদনগরের নিজামশাহী সুলতানদের সেনা-বিভাগে কাজ করেন এবং জাগীর ভোগ করেন। কিন্তু এসব বিক্ষিপ্ত, অপ্রধান, প্রায় অবজ্ঞাত মারাঠা সরদারগণ রাজ্যগঠনে অক্ষম ছিলেন, এবং সেরূপ কাজের কল্পনাও করেন নাই।

মুসলমান যুগে মারাঠা সামরিক শক্তির আদর এবং বৃদ্ধি আরম্ভ হইল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে, ঠিক আকবরের মৃত্যুর পর, যখন জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া মালিক অম্বর অশেষ বাধা ও বিপত্তি জয় করিয়া নিজামশাহী রাজবংশকে খাড়া করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সুলতান প্রথম প্রথম তাঁহার সহায়ক ছিলেন; অম্বর মুঘলদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ করেন এবং এই সব যুদ্ধে মিতাহারী দ্রুতগামী হালকা মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য লাগাইয়া মুঘলদের ভারি বর্মাবৃত ধীরগামী বিলাসপ্রিয় অশ্বারোহী সৈন্যদের রোধ করিতে, তাহাদের রসদ লুটিতে এবং পথচলা বন্ধ করিতে সক্ষম হন। তখন মারাঠারা সেই নবীন যুগেও নিজেদের যে একটা সামরিক মূল্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ

জানিতে পারিল। উচ্চ বেতন পা য়ায় তাহাদের সরদারগণ নিজ নিজ অনুচর দলের সংখ্যাও ক্রমে বেশ বাড়াইলেন।

আর সেই সময়েই মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য অহমদনগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল। শাহজীর শ্বশুর, শাহজীর খুড়া প্রভৃতি, এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, আবার বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ওপক্ষে সৈন্যদল লইয়া পার হন। এইরূপ কাজ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালময় চলিয়াছিল। ফলে মারাঠা নেতা ক'জন অত্যন্ত বড় এবং দেশমান্য হইয়া উঠিলেন, শাহজী তাহারই চরম সীমায় পৌঁছিয়া, মালিক অম্বর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর অহমদনগরের বিনষ্ট-প্রায় রাজবংশে 'কিং-মেকার' অর্থাৎ ইচ্ছামত রাজ-পুত্তলিকা-সৃষ্টিকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন; ঠিক মালিক অম্বরের পর শাহজীর মত কোন প্রবল ও প্রধান শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে মাথা তুলে নাই। সমস্ত দেশটা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত।

শাহজীর এই মহত্ত্ব ১৬২৯ হইতে ১৬৩৬ পর্যন্ত সাত বৎসর মাত্র ছিল। তাহার পর বাদশাহ শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, তিনটি বৃহৎ সুচালিত সেনাদলের মিলিত চেষ্টার ফলে সব শত্রুকে দমন করিয়া, শাহজীকে প্রায় পথের ভিখারীর মত দশায় আনিয়া মহারাষ্ট্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হইবার আশা সমূলে নষ্ট হইল। তিনি পুণা জেলার জাগীর পুত্রকে দিয়া নিজে নিজামশাহী-রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজের চাকরি লইলেন, এবং মহারাষ্ট্র হইতে অতিদূরে কর্ণাটক প্রদেশে—অর্থাৎ মহীশূর, আর্কট জেলা এবং বেলগাঁও অঞ্চলে, জাগীর অর্জন করিলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যে সর্বপ্রধান হিন্দু সামন্তের পদে

উঠিলেন বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। স্বদেশে স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যদি তাঁহার কখন ছিল, তবে তাহা ১৬৩৬ সালেঃ একেবারে দূর হয়। এরূপ স্বরাজ্য-স্থাপন তাঁহার পুত্র শিবাজীর কীর্তি, সে কাহিনী পরে বলিব।

কিন্তু মারাঠা জাতীয় অভ্যুদয়কে শুধু কোন মহাপুরুষের কর্ম বলিলে অসত্য হইবে। একথা মানি যে, মহাপুরুষ না জন্মিলে এই কার্য সফল হইত না, এবং যখন মহারাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে মহাপুরুষের অভাব হইল তখনই মারাঠা স্বাধীনতা অস্ত গেল। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে জাতীয় জন-সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি গুণ না থাকিলে, সমস্ত দেশময় একটা জাগরণ দেখা না দিলে, প্রবল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ এবং সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভব হইত না! দেড় শ বৎসরের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব শক্তি শুধু একজন মানুষের উপর, মাত্র একপুরুষব্যাপী কর্মীর উপর, নির্ভর করিয়া টিঁকিতে পারে না,—যেমন রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল, কারণ শিখরাজ্য শুধু ব্যক্তিগত সৃষ্টি ছিল।

সুতরাং মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের বীজমন্ত্র হইতেছে মারাঠা জাতীয় চরিত্র। ইহাই আমরা এখানে ভাল করিয়া দেখিব। মারাঠা চরিত্রে আত্মনির্ভরতা, সাহস, অধ্যবসায়, কঠোর আড়ম্বর-শূন্যতা, সাদাসিদে ব্যবহার, সামাজিক সাম্য এবং প্রত্যেক মানবেরই আত্ম-সম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এই সব মহাগুণ জন্মিয়াছিল। তের শ বৎসর আগে চীনা পর্যটক ইউয়ান চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপই চক্ষে দেখিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—'এই দেশের অধিবাসীরা তেজী ও যুদ্ধপ্রিয়; উপকার করিলে কৃতজ্ঞ থাকে; অপকার করিলে প্রতিহিংসা খোঁজে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে তাহারা

তজ্জন্য ত্যাগস্বীকার করে, আর কেহ অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়ে না।'

"মারাঠা সৈন্যগণ সাহসী, বুদ্ধিমান্ এবং পরিশ্রমী, রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা শত্রুর জন্য ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া নিজ বুদ্ধিবলে নিজকে বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানর সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রণালী বদলানর ক্ষমতা—একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফগান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য কোন জাতির নাই।...স্ত্রী স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ হইল এবং সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল। দেশের ধর্মও এই সামাজিক সাম্যভাব বাড়াইয়া দিল। এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল যে মহারাষ্ট্র দেশে ভাষায় ধর্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য একতা ও সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ছিল; তাহাও পূরণ করিলেন শিবাজী।"

উপরের কথাগুলি দ্বারা আমি অনেক পূর্বের এক গ্রন্থে মারাঠা চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। এ কথাগুলি এখনও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের মত গুরুতর কার্যের পক্ষে এইসব ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আরও মূল্যবান্ কয়েকটি সুবিধা আবশ্যক; তাহা ছিল বলিয়াই মারাঠারা সফলতায় পৌঁছিতে পারিয়াছিল। সেই সুবিধাগুলির প্রথমে ইংরাজী নাম দিয়া পরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব—self-sufficing villages, experience of communal labour, local autonomy অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে প্রত্যেক গ্রামে নানা বর্ণের নানা ধর্মের অধিবাসীরা একত্র মিলিয়া কর্মবিভাগ করিয়া লইয়া সমস্ত গ্রামের যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিত; রাজাকে গ্রামের মোট খাজানা দিয়াই

তাহারা খালাস, আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপার তাহারা নিজেরাই সর্বোচ্চ অধিকারী রূপে নির্বাহ করিত, বাহিরের কাহারও মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত না, বাহিরের কেহ গ্রামের জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। এইগুলিকে Indian Village Communities বলা হয়, ইহার প্রত্যেকটি একটি ছোট প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের মত, a petty republic. ইউরোপে মধ্যযুগের মাঝামাঝি এইরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়; ইটালিতে এইরূপ নাগরিক গণতন্ত্র প্রচুর খ্যাতিলাভ করে, কিন্তু সেগুলি আকারে জন-সংখ্যায় এবং যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতায় ছোট ছোট রাজ্যের সমান ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রতি গ্রামে গ্রাম্য কর্মচারিগণের পদ পুরুষানুক্রমে চলিত, কখন কখন বা বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রামের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটিত না। গ্রামবাসীরাই জুরি হইয়া ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করিত এবং জুরির সিদ্ধান্তে সকলে সহি বা ঢেড়া দিয়া (নিরক্ষর লোকের পক্ষে লাঙ্গল বা ছোরার ছবি আঁকিয়া) তাহা দলিলে পরিণত করিত। এগুলির ফার্সী নাম মহজর-নামা। মধ্যযুগের ইংলণ্ডের গ্রাণ্ড জুরীর মত, কোন কোন মারাঠী মহজরে ৫০।৬০ জন লোকের স্বাক্ষর বা টীপ আছে।

সুতরাং প্রতি গ্রামই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ত্যাগ করিয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া পুরুষানুক্রমে সময় কাটাইত। গ্রামের লোকজন দৈনিক স্বায়ত্তশাসন করিয়া করিয়া পাকা হইয়া গিয়াছিল। জনসঙ্ঘ একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর কার্যগুলি কিরূপে করিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা এই জাতির গ্রামবাসীদের মজ্জাগত হইয়াছিল। সংগঠন বলিয়া যে একটা কথা আজকাল আমরা শুনিতেছি, তাহা মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে অতি পুরাতন, অতি অভ্যস্ত জিনিষ ছিল। রাষ্ট্রশাসন ও নেশন-গঠনের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও

শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মহারাষ্ট্রে ইহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর ইউরোপে এইরূপ কমিউন্ উদ্ভব হয়, তাহার বিবরণ Vinogradoffএর লেখায় সকলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা মহারাষ্ট্রের মত বহু শতাব্দী ধরিয়া টেঁকে নাই।

এইরূপে মহারাষ্ট্রে সমাজ, নীচু হইতে গঠিত হইয়া উঠে। এইরূপ গঠনই স্থায়ী এবং লোকহিতকর। উপরের সর্বশক্তিমান্ কর্তা কোন মুসোলিনী বা আলাউদ্দীন খিলজী, হুকুম দিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ক্রীতদাসের মত একটি পথবিশেষে চালাইলেন, ইহাতে নেশন গঠিত হয় না, এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না—উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। সে দুর্ভাগ্য মারাঠা জাতির হয় নাই; তাই আজ ব্রিটিশ বিজয়ের পরও মারাঠা জাতি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত জনশক্তি ও সঙ্ঘপ্রাণ কখনও বিলোপ পায় না।

এই ত গেল ঐ লোকদের জাতীয় চরিত্র, এখন ইতিহাসে ইহার ফল দেখা যাক। অতি আধুনিক মারাঠা লেখকগণ বলেন যে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দু স্বরাজ বা স্বাধীন মারাঠী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা ও চেষ্টা শাহজী হইতে আরম্ভ হয়, এবং শিবাজী পিতার এই নীতিটি চুরি করিয়া তাঁহারই আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু শাহজীকে এই গৌরব দিতে ইতিহাস অস্বীকার করে। তিনি কোন বিষয়েই শিবাজীর পথ-প্রদর্শক ছিলেন না এবং অনেক বিষয়ে ঠিক বিপরীত। শিবাজীর কীর্তির মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রহিবে।

এখন দেখা যাউক, এই মারাঠা জাতিকে লইয়া শাহজী কি করিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে তিনি অহমদনগরের স্থলতানদের কর্মচারী মাত্র ছিলেন, এবং সেই রাজবংশে অবনতি ধরিবার পর মালিক অম্বর যেমন একটা রাজপুত্তলিকা খাড়া করিয়া নিজে নামে রাজপ্রতিনিধি

থাকিয়া কার্যত সমস্ত রাজশক্তি চালাইতেন, সেই মত মালিক অম্বরের মৃত্যু হইলে শাহজীও অপর এক রাজপুত্রকে খাড়া করিয়া তাহার মাথায় রাজছত্র ধরিয়া, নিজে দেওয়ানরূপে যতটা পারিলেন দেশ শাসন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তিনি কখনও নিজেকে রাজা বা স্বাধীন শক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, সর্বত্রই পরের চাকর এই আখ্যা দেন। আর তাঁহার জীবনের এই প্রথম অংশে (১৬২৯-৩৫) তিনি মালিক অম্বরের মতই বিজাপুররাজ হইতে অনেক সাহায্য পান, এবং সেই সহায়তার বলেই নিজ নবজাত ক্ষুদ্র শক্তিকে মুঘল বাদশার বিরুদ্ধে খাড়া করিতে সাহসী হন।

শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, মারাঠা নেতার এই চেষ্টা সমূলে নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত ও কর্ণাটকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য সন্ধি করান (১৬৩৬ খৃঃ)। এই শেষ জীবনে (১৬৩৬-৬৪) শাহজী বিজাপুরের জাগীরদার মাত্র থাকিয়া প্রভুর নামে কর্ণাটকের নানা স্থান (তাঞ্জোর নহে—তাঁহার কর্তৃক তাঞ্জোর জয় হয় এটা পুরাতন ভ্রান্তবিশ্বাস) জয় করিয়া তাহার কিয়দংশ নিজ জাগীররূপে পান। কিন্তু এখনও তিনি চাকর মাত্র, স্বাধীন রাজা নহেন। এই সময়ে তাঁহাকে ঠিক গোলকুণ্ডার দেওয়ান মির জুমলার সমান পদস্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে সত্য হইবে।

ফলত, যদিও শাহজী শেষ বয়সে খুব ধনী ও ক্ষমতাশালী হন, যদিও মুরার জগদেবের মৃত্যুর পরে বিজাপুর সুলতানের রাজ্যে শাহজীই হিন্দু জাগীরদারদের মধ্যে সর্বপ্রথম বলিয়া গণ্য হন, যদিও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র একোজী তাঞ্জোর রাজ্যের রাজা হন, তথাপি শাহজীকে হিন্দু-স্বরাজের প্রতিষ্ঠাতা, ছত্রপতিত্বের আদর্শ, বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

বিখ্যাত বিজয়নগর সাম্রাজ্য ১৫৬৫ সালের পর আরও সত্তর বৎসর হীন-প্রভায় ও খণ্ডাকারে চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমেই উহার রাজশক্তির দুর্বলতা, মণ্ডলদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়া উহার রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং যখন শাহ্জহান ১৬৩৬ সালের সন্ধি দ্বারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন এই দুইটি মুসলমান রাজার পক্ষে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অভিযান পাঠাইয়া কর্ণাটক জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় রহিল না। অর্থাৎ ভূতপূর্ব বিজয়-নগর রাজ্যের খণ্ড প্রদেশগুলি লইয়া এই দুই সুলতানের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি এবং প্রভু মুঘলবাদশার নিকট কাঁদিয়া নালিশ করা আরম্ভ হইল। এই সব অভিযান ১৬৩৭ সাল হইতে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত বেগে চলিয়াছিল। তাহার পর বিজাপুর রাজশক্তিতে ঘুণ ধরিল, আদিলশাহী ক্ষমতা-বিস্তার মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়া শেষে থামিয়া গেল; শুধু শাহজী মহীশূরে এবং অপর ক'জন সরদার পূর্ব-কর্ণাটকে অর্থাৎ আর্কট জেলা দুইটিতে কোন কোন স্থান জয় করিয়া জাগীর স্থাপন করিলেন। গোল-কুণ্ডা রাজ্যেও মিরজুমলার কর্মত্যাগ (১৬৫৬), কুমার আওরংজীবের আক্রমণ এবং রাজপরিবারে কলহের ফলে বিজয়বাহিনী থামিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা তো হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুঠ ও ভাগাভাগি কাজে সুলতানদের অন্যান্য কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন। ইহাকে শিবাজীর জীবনের আদর্শ বলা যাইতে পারে না।

নিজ মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে শাহজীর সম্বন্ধ প্রথম সামান্য মাত্র—অর্থাৎ মুসলমান সুলতানের ভৃত্যরূপে ছিল; এবং ১৬৩৬ হইতে এই

সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁহার জন্মভূমিতে শুধু দেড় লাখ টাকার জাগীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহা তিনি পুত্র শিবাজীকে দিয়া চলিয়া গেলেন। জন্মভূমিতে তিনি কখনও নিজ মাথার উপর রাজছত্র ধারণ করেন নাই, জমিদার মাত্র ছিলেন; পুণা, চাকণ, সুপা, বারামতী এই গ্রামগুলি তাঁহার থানা মাত্র ছিল, ১৬২৯—১৬৩৫ সালের মধ্যে তাঁহার অধিকার করা সব দুর্গ মুঘলেরা কাড়িয়া লইয়াছিল।

শাহজী ও শিবাজী যে এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন নাই, তাঁহাদের জীবনের কাজ যে পৃথক পৃথক শ্রেণীর, তাহা একটি বিষয় ভাবিলেই সুস্পষ্ট হইবে। ১৬৫৪ সালের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগনে মুঘল সূর্য অসহ্য দীপ্তিতে বিরাজমান ছিল, ছোটবড় সকলেই বুঝিল যে দিল্লীর বাদশাহই আমাদের সর্বেসর্বা প্রভু, নামে অন্য কেহ সুলতান হউন না কেন। শাহজী ১৬৩৬ সালের পর হইতে কখনও মুঘলদের সংঘর্ষে আসেন নাই, এমন কি বিজাপুর সুলতানেরও বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়ান নাই। এরূপ রাজভক্ত জাগীরদার কিরূপে বিদ্রোহী স্বাধীন শিবাজীর পথ-প্রদর্শক হইবেন?

সুতরাং "হিন্দবী স্বরাজ" শিবাজীর নিজস্ব কল্পনা, একমাত্র শিবাজীর সফল প্রচেষ্টা। তাহা শিবাজীর জীবন সম্যক্ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

শিবাজী

মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনপূজ্য সাধু রামদাস স্বামী নিজ দীর্ঘ জীবনের অন্তে তাঁহার শেষ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

শিব রাজার রূপ স্মরণ কর,
শিব রাজার দৃঢ় সাধনা স্মরণ কর,
শিব রাজার কীর্তি স্মরণ কর,
ভূমণ্ডলে।
সকল সুখ ত্যজিয়া,
যোগ সাধন করিয়া,
রাজা সাধনায় তিনি কেমন
দ্রুত অগ্রসর হন।
শিব রাজাকে স্মরণ রাখিও
জীবনকে তৃণ সমান মনে করিও,
[তবেই] ইহলোকে পরলোকে তরিবে,
কীর্তিরূপে।

আড়াই শ বৎসরেরও অধিক কাল হইল এই কথাগুলি লিখিত হয়, কিন্তু আজও বিপুল মারাঠা জাতীয় জনসমাজে ইহা জপ-মন্ত্র স্বরূপ হইয়া আছে। অন্যপ্রদেশীয় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলত যদি আমরা শিবাজীর আরম্ভের পুঁজিপাটার সহিত তাঁহার জীবনশেষে সঞ্চিত কীর্তিকলাপ তুলনা করি, অথবা তাঁহার দেহত্যাগের পরও তাঁহার মৃত্যুহীন আত্মা ও স্মৃতির জীবন্ত প্রভাব স্মরণ করি, তবে জগৎ ইতিহাসের সর্বোচ্চ কয়েকজন মহাপুরুষের মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতেই হইবে।

মারাঠাজাতির মধ্যে শিবাজীর স্মৃতি দেবতুল্য সম্মানের সহিত পূজা করা হয়। তাঁহার জাত্ অর্থাৎ বর্ণ ছিল মারাঠা; যদিও মারাঠাদের বড় লোকেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তথাপি ইহাদের অনেকে কৃষিজীবী বা প্রহরীর কাজ করিয়া দিন কাটায়, এবং মারাঠা জাতের মধ্যে নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের কুন্‌বী অর্থাৎ কৃষকের সমান বলিয়া সমাজে গণ্য করা হয়, এবং এই দুই জাতের আচার ব্যবহার প্রায় এক মতই।

ইহা সত্ত্বেও শিবাজীর কীর্তিকলাপ এত মহান্ যে এ প্রদেশের অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ জাতও তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন; তাঁহার তিরোধানের সময় অকালে সূর্যগ্রহণ ভূমিকম্প প্রভৃতি ঠিক যীশুর তিরোধানের মত, নৈসর্গিক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। মহারাণা প্রতাপসিংহের মতই শিবাজী এবং তাঁহার প্রধান অনুচরগণ শত শত নাটক নভেল প্রণোদিত করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। জাতীয় বীর, রাষ্ট্রনেতা, নেশান-গঠনকারী আদি পুরুষ, এই অভিধেয়ের প্রত্যেকটিই তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তাঁহার কার্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই যুগের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা চিন্তা করিলে, তবে তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারা যায়। ফলত পুরুষকার কিরূপে ইতিহাসকে বদলাইয়া দিতে পারে, জনসঙ্ঘকে নূতন পথে চালাইয়া দিতে পারে, ভারতে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শিবাজী।

শিবাজীর ইতিহাসের কাঠামো অনেকদিন হইল আমাদের জানা আছে। গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই এতদিন নানা ভাষায় অনুবাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু গত উনিশ বৎসরের গবেষণার ফলে আমরা শিবাজীকে আরও সত্য, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়াছি। এখন আর গ্রাণ্ট ডফের কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাকা

চলে না। গ্রাণ্ট ডফের অজানিত কতকগুলি প্রথমশ্রেণীর মৌলিক উপাদান অতি অল্পদিন হইল আমাদের হস্তগত হওয়ায়, তাঁহার রচিত শিবাজী-চরিতে বিপ্লব-সমান পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। প্রথম আবিষ্কার, জয়পুরের মীর্জারাজা জয়সিংহের সমস্ত চিঠি-পত্র; ইহাতে ১৬৬৫-১৬৬৭ পর্যন্ত শিবাজীর কার্যকলাপ অতি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আমরা জানিয়াছি। দ্বিতীয়, কুমার আওরংজীবের মুন্সী কাবিলখাঁর রচিত আদাব্-ই-আলমগিরিতে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত এই মুঘল রাজকুমার এবং শাহজী ও শিবাজীর পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণিত আছে। শিবাজী এবং তাঁহার কয়েকজন কর্মচারীর ফার্সী পত্র বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক হস্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। বিজাপুরের সভাপণ্ডিত জহুর-বিন-জহুরীর মুহম্মদনামা এবং অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত ফার্সী ফর্মান ও সনদ আবিষ্কার হওয়ায়, শাহজী এবং তরুণ শিবাজীর ইতিহাস এখন সমসাময়িক দলিলের দৃঢ় ভিত্তিতে খাড়া করা যায়। পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ (Francois Martin)এর দিনলিপি হইতে মারাঠা বীরের কর্ণাটক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ এবং তাঁহার শিবিরের চাক্ষুষ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি (প্যারিস হইতে নকল আনিয়া ১৯২৪ সালে আমি ইহা প্রথম প্রকাশ করি)। পর্তুগীজ ভাষায় গোয়া নগরে যে সব কাগজপত্র আছে তাহা নিঃশেষে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ছাপিয়া, শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থুর্লেঁকর মহাশয় শিবাজীর জীবনের এই দিকটার উপর অনেক নূতন আলোক পাত করিয়াছেন। আর মারাঠী ভাষায় লিখিত জেধে বংশের শকাবলীতে আমরা সে সময়ের অনেক ঘটনার সঠিক তারিখ এবং সূক্ষ্ম বিবরণ—যদিও অল্প কথায়—পাইয়াছি। ইহা অমূল্য উপাদান। সংস্কৃতভাষায় তৎকালে লিখিত শিবভারতম্ পর্ণালপর্বতগ্রহণাখ্যানম্ এবং শিবরাজরাজ্যাভিষেককল্পতরু

এই তিনখানি ইতিহাস অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। আর ফার্সী ভাষায় মাসির্-এ-আলমগীরী নামক সরকারী ইতিহাস ডফ্ সাহেবের অজ্ঞাত ছিল।

এই ত গেল নূতন আবিষ্কার। তাহার পর ডফের জানিত উপকরণ অধিক যত্নের সহিত নিঃশেষে ব্যবহার করিয়া, তিনি যাহা ছাড়িয়াছেন এরূপ অনেক কাজের কথা ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই উপকরণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বন্দরের ইংরাজ ও ওলন্দেজ কুঠীর পত্র, ভীমসেনের ফার্সী আত্মকাহিনীর মূল গ্রন্থ প্রভৃতি প্রধান। তথাকথিত "রায়গড় লাইফ্ অব্ শিবাজী" অর্থাৎ মালকরে বখর্; এটা এখন অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে আমরা আগাগোড়া সংশোধন করিতে পারি। ইহার ফলে শিবাজীর ইতিহাস একেবারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সত্যস্বরূপ এতদিনে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু ইতিহাস ও জীবন কাহিনী একজন মানুষের বাহ্য আকার ও কর্মগুলি মাত্র আমাদের দেখায়। তাঁহার চরিত্র ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এই সব বাহ্য ঘটনার উপর ঐতিহাসিক দর্শন, যাহাকে Philosophy of History বলে, তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শিবাজীর চরিত্রের যে বর্ণনা আমি পূর্ব এক গ্রন্থে করিয়াছি, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব—

"আশ্চর্য সফলতা ও অতুলনীয় খ্যাতিতে মণ্ডিত হইয়া শিবাজী সেই যুগের ভারতে সর্বত্রই হিন্দুদের চক্ষে এক নূতন আশার উষাতারারূপে দেখা দিলেন। একমাত্র তিনিই হিন্দুদের জাত ও তিলকের, শিখা ও উপবীতের রক্ষক ছিলেন।...তাঁহার চরিত্র নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, সন্তানপ্রীতি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মানুরাগ,

সাধু সন্তের প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জন, শ্রমশীলতা এবং সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব সে যুগে অতুলনীয় ছিল।...তিনি সর্ব ধর্মের মন্দির ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি সম্মান এবং সাধু সজ্জনের পোষণ করিতেন।...সর্ব জাতি, সর্ব ধর্মসম্প্রদায়, তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধন মান রক্ষা তাঁহারই দান।

"তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত—দেশের যত সৎ দক্ষ ও মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত।...সৈন্যদের সঙ্গে সদাসর্বদা মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দুঃখকষ্ট বিপদের ভাগী হইয়া, ফরাসী সৈন্য মধ্যে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি তাহাদের একাধারে বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন।

"সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্তে, শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সব বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্মের নানা সূত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনুষ্ঠান-গঠনে নৈপুণ্য—এই সকল গুণের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখান।......

"তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন দান তাঁহার অমর কীর্তি।

"ফলত শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্তা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীর।" [আমার রচিত "শিবাজী", ২৫৯—২৬২]। এখানে এই পুনরাবৃত্তি শেষ করিলাম।

শিবাজীর কাযগুলি এবং সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় হয় শিবাজীর দৃষ্টিশক্তি। তখন রাজনৈতিক গগন অন্ধকার, চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, অথচ তিনি যেন দৈবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেন কোন্ ঘটনার

কি ফল হইবে, শক্তিগুলির মিলন বা সংঘর্ষ কোন্ দিকে গড়াইবে। তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় তরুণ যুবক ছিলেন, কোন বড় শহর বা রাজসভা দেখেন নাই; ছোট খণ্ড খণ্ড জাগীরে আমলাগিরি করিয়া শাসন ও যুদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এমন কি পুস্তক পড়িবার বিদ্যাও শিক্ষা করেন নাই, তাহার জন্য অবসরও পান নাই। তথাপি তিনি চারিদিকে প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে, অথবা সময় বুঝিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই। কোন ভুলের চাল চালেন নাই। লোকে ভাবিত ইহা তাঁহার ইষ্টদেবী ভবানীর মন্ত্রণা বা স্বপ্নাদেশের ফল। আমরা বলিব ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। জগতের সব দেশেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মবীরগণ এই নির্ভুল দূরদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন; সাধারণ প্রতিভার লোক, হাজার সুবুদ্ধি সৎ বা কর্মঠ হউক না কেন, এই মহাশক্তিতে বঞ্চিত। অর্থাৎ ইংরাজীতে genius এবং talentএর মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ইহাই।

তাহার পর, প্রকৃত রাজার, সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকনায়কের প্রধান চিহ্ন, লোক চিনিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের ঠিক চরিত্র এবং কর্মকুশলতা অথবা বিশেষ গুণগুলি অতি অল্প সময়ে দৈবজ্ঞের মত ঠিক বুঝিয়া লইতে পারা। এই গুণে শিবাজী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আওরংজীব বাদশাহ অতুলনীয় ছিলেন। এইরূপে লোকচরিত্র নির্ভুল বিচার করিয়া তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে তাহার ব্যক্তিগত উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিতেন, অর্থাৎ ইংরাজী উপমায় যে বলে গোল খুঁটোকে চৌকোণা গর্তে বসাইও না, শিবাজী কখনও সেরূপ ভুল করিতেন না। ইহাও একটি দৈবশক্তি এবং জগতে সফলতা লাভের একটি প্রধান মন্ত্র।

প্রভুর পক্ষে সফলতার আর একটি মন্ত্র এই যে, সব শ্রেণীর কর্মচারীর শ্রমের সামঞ্জস্য করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত চেষ্টাকে

সমবায়ের সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া, সেই সূত্র সর্বদা নিজ হাতে রাখিয়া অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প বাধাতে কাজ হাসিল করা। শিবাজী সব শ্রেণীর সেবকের নিকট হইতে প্রফুল্লবদনে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সেবা ও শ্রম আদায় করিবার গোপনীয় মন্ত্রটি জানিতেন। যিনি প্রকৃত লোকনেতা কেবল তিনিই এইরূপ করিতে পারেন। তিনি নিজে খাটেন এবং অন্যকে খাটাইতে জানেন, নিজে খাটেন সর্বদা সজাগ পর্যবেক্ষণে এবং ভৃত্যদের কাজের সমন্বয়ে—ভৃত্যদের কাজ নিজ হাতে করিয়া নহে। শেষোক্ত ভুলটি অর্থাৎ সব কাজ নিজে করিব বা চালাইব, স্থানীয় প্রতিনিধির হাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব দিব না, এই মহাভ্রান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণের ফলে দ্বিতীয় ফিলিপ, আওরংজীব এবং আমাদের বড়লাট লর্ড কেনিংএর শাসন বিফলতার মধ্যে ডুবিয়া যায়, অথচ তাঁহারা প্রত্যেকেই সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ এবং শ্রমী শাসক ছিলেন। শিবাজী কিন্তু নিজের কোন ভৃত্যকে তাঁহার উপর প্রভু হইয়া বসিয়া তাঁহার কার্য পরিচালনা করিতে দিতেন না, কারণ তিনি নিজেই সর্বত্র কর্তা, সর্বত্রই পরিদর্শক হইয়া থাকিতেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ফিরিঙ্গী সেনাপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, কারণ দৌলত রাও নিজে অকর্মণ্য নির্বোধ অলস। শিবাজী ইহার বিপরীত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রদেশের সেনানী ও আমলাকে খাটাইতেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রেষারেষি সংঘর্ষ বা স্ব স্ব প্রধানতা প্রবল হইতে দিতেন না। দেশস্থ, কর্হাড়ে, শেনবী, চিৎপাবন এই চারি শ্রেণীর পৃথক ব্রাহ্মণ, মসীজীবী প্রভু-কায়স্থগণ, জাত মারাঠাগণ, এমন কি নাপিত, বণিক্, গুজর, এবং মুসলমান পর্যন্ত তাঁহার শাসনবিভাগে ও সৈন্যদলে কাজ করিত, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া এবং প্রভুকে মানিয়া

চলিয়া। তাঁহার পরবর্তী যুগে যখন মারাঠা রাজ্যে কর্মচারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইল, প্রভুর শক্তি অবহেলা ও অগ্রাহ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন সেই সোনার রাজত্ব ভাঙ্গিয়া গেল। অরাজকতা উপর হইতে নীচে আসিয়া পৌঁছিল—ঠিক যেমন রণজিৎ সিংহের অযোগ্য পুত্রদের সময়ে পঞ্জাবে ঘটিয়াছিল।

সবার উপর শিবাজীর রাজনৈতিক অনুভব-শক্তিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নব্য ইটালীর একতা-বন্ধনের এবং স্বাধীনতা-লাভের পুরোহিত কাউণ্ট কাভূর বলিতেন যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ কর্মবীরের লক্ষণ হইতেছে এই যে কোন্ কাজটা সম্ভব তাহা দৈবজ্ঞের মত বুঝিতে পারা—বিনা তর্কে, বিনা চিন্তায়, স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা,—যেমন হাঁসের বাচ্চা জন্মিয়াই সাঁতার দিতে পারে। এই শক্তির অভাবে অনেক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সাধু শাসক, মহারথী তলাইয়া যান, প্রকৃত কার্যক্ষেত্রের পরীক্ষায় হার মানেন। এই দিক্ দিয়া দেখিলে শিবাজীকে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ অথবা ষ্টেটস্ম্যান বলিতে হইবে। আপনারা জানেন জিনিয়াস্ এবং ট্যালেণ্ট এই গুণ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ঠিক সেই পার্থক্য ষ্টেটস্ম্যান এবং পলিটিশিয়ানের মধ্যে আছে। শিবাজী প্রকৃতই ষ্টেটস্ম্যান ছিলেন—যেমন ফরাসী রাজা চতুর্থ হেনরী অথবা ইংলণ্ডের প্রথম এডওয়ার্ড ও এলিজাবেথ।

আবার প্রকৃত কর্মবীরের মত তিনি কোন নূতন কাজ বা নূতন অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে জমি পরিষ্কার করিয়া পথ বাঁধিয়া তবে অগ্রসর হইতেন; এই যেমন সুরট বন্দর লুটিবার অথবা বেরার প্রদেশ প্রথমবার আক্রমণ করিবার পূর্বে। তিনি অনেক মাস ধরিয়া সেই সেই স্থানে চর পাঠাইয়া সব গোপনীয় তথ্য ও পথঘাট জানিয়া, এবং সেখানে উপস্থিত হইবার পর তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগে হইতে গুপ্ত

প্রতিনিধি বসাইয়া রাখিয়া, তবে নিজ দেশ হইতে যাত্রা করিতেন, এবং এইরূপ স্থানীয় জ্ঞান ও সহায়কের যোগাযোগে তাঁহার কর্মঠ মিতাহারী আস্‌বাববিহীন অশ্বারোহী দল লইয়া এত দ্রুত অগ্রসর হইতেন যে শত্রুগণ তাঁহার পৌঁছার পূর্বে সতর্ক হইতে পারিত না, ভাবিত যে শিবাজীর বর্গীরা আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। বেরারের সর্বাপেক্ষা ধনশালী শহর কারঞ্জা যখন শিবাজী প্রথম লুঠ করিলেন, তখন অতি প্রত্যূষে শহরবাসীরা ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে যাহা কোনদিন শুনে নাই, ভাবে নাই সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, মারাঠা সৈন্যের উপস্থিতি ২০০ মাইলের মধ্যেও শুনা যায় নাই, অথচ তাহারা রাতারাতি পৌঁছিয়া ঐ শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

ফলত শিবাজীকে শুধু বীর যোদ্ধা বা বিচক্ষণ সেনানায়ক ভাবিলে ভুল হইবে। তিনি এই মহাগুণের সঙ্গে সঙ্গে দৌত্যকুশলতা এবং শাসন-দক্ষতা এই দুটি বিপরীত শ্রেণীর গুণেও ভূষিত ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ক্রমওয়েল ও মার্লবরো, ওয়েলিংটন এবং পঞ্চম হেনরী মাত্র এই আশ্চর্য গুণ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। ভারতে আকবর।

এইতো শিবাজী চরিত্রের বিশ্লেষণ। এখন দেখা যাউক তাঁহার কীর্তিগুলি কি কি। আমি এখানে তাঁহার জয়-পরাজয়, ধন-দৌলত বা রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দিব না, তাহা আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর জানেন, এবং আমি এক বাঙ্গালা গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। আজ দেখাইব তিনি মারাঠা জাতির জন্য নূতন কি করিলেন, তাঁহার দান কি কি।

শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে মারাঠাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা, তাহাদিগকে একতার সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া নেশান্‌-সৃষ্টির আরম্ভ করা। এরূপ কার্য জগতের ইতিহাসে প্রায়শ নূতন ধর্মপ্রবর্তকেরাই করিয়া

থাকেন, ক্বচিৎ কোন কোন দেশে এক এক জন মহাপুরুষ নেতা বা অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভাশালী পুরুষ করিতে পারেন। শিবাজী এই শ্রেণীর নরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আজও তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রে এবং মারাঠাজাতির গুণগ্রাহী অন্য প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে দেবতার সমান পূজা করা হয়। তাই আজও তাঁহার সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে লোকে এত যত্নের সহিত আলোচনা করে এবং অনেকে আদর্শ বলিয়া অনুসরণ করিতে চায়। তিনি প্রথমে মারাঠাদিগকে বুঝাইলেন "মানুষ আমরা, নহি ত মেষ", কার্যদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে তাহারা এই নবযুগেও রাজ্যগঠন করিতে, শাসন চালাইতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হইতে পারে, তাহাদের উন্নতি সম্ভব এবং সে উন্নতিলাভ করা তাহাদের নিজের হাতেই। যুগ যুগ বহিয়া অধীনতা ও জাতীয় অবসাদের ফলে যে নৈরাশ্য জন্মে তাহা দূর করিয়া একটা রাষ্ট্রের মৃতদেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার করার মত বড় কাজ জগতে আর নাই। শিবাজী তাহাই করেন, এবং তিনি মারাঠা জাতির মধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও চলিতেছে—সমগ্র ভারতের চক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

চলিত কথায় বলা যাইতে পারে যে শিবাজী প্রথমে মারাঠা জাতির —এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্য প্রদেশের হিন্দু প্রজাদেরও ভয় ভাঙ্গাইলেন। তিনি যখন ক্ষুদ্র জমিদার হইয়াও স্বাধীনতার পথে প্রথম পা ফেলিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) তখন তাঁহার উপরের শক্তি, অর্থাৎ বিজাপুর-রাজ, বাহ্যত অক্ষুণ্ণ প্রতাপে, আর রাজার উপর রাজা অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহ মধ্যাহ্নের সূর্যের মত সমস্ত ভারতকে উত্তপ্ত করিতেছিল। এই মুঘল রাজশক্তির সমক্ষে ভারতের সব হিন্দু-মুসলমান রাজ্যগুলি হার মানিয়াছিল, এমন কি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার এতদিনকার স্বাধীন মুসলমান সুলতান

দুটিও দিল্লীশ্বরের নিকট মাথা নত করিয়া নিজদের তাঁহারই সামন্ত মাত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া, দিল্লীর বাদশাহের নাম নিজ নিজ রাজধানীতে খুৎবা পাঠের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন, আর অহঙ্কারী দিল্লীশ্বর এই দুই সুলতানকে চিঠি-পত্রে শাহ অর্থাৎ রাজা না বলিয়া খাঁ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত প্রজা এই নাম দিয়া লিখিতেন,—আদিল খাঁ, কুতব খাঁ, ঠিক যেন মুঘল সরকারের চাকর খাঁ জহান বা খাঁ দৌরানের মত।

অথচ এই মুঘল চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়াইলেন, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিলেন, কে? একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, পরাজিত, নির্ব্বাসিত জাগীরদারের ছেলে, যাঁহার আয় তখন তিন লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। সমস্ত ভারত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিল। ইহা শিবাজীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এইরূপ দুরূহ, প্রায় অসাধ্য, কাজে সফল হওয়াই তাঁহার দেবদত্ত প্রতিভার প্রমাণ। জগতে নূতন পথ, নূতন দেশ আবিষ্কারকের যে মান, রাজনৈতিক ভারতে শিবাজীর তাহাই প্রাপ্য।

তাহার পর কখনও দুই শত্রুর, কখনও বা তিন শত্রুর—মুঘল, বিজাপুর, পোর্তুগীজ, ইংরাজ—ইহাদের একসঙ্গে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তিনি দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন—এই সব দ্বন্দ্বে তাঁহার কত বুদ্ধির স্থিরতা, হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং উপায় উদ্ভাবনে বিচিত্র মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহার ইতিহাস পাঠকেরাই জানেন। ঠিক কখন বা কাহার সহিত মৈত্রী করিতে হইবে, অথবা যুদ্ধ আরম্ভ লাভকর হইবে, তাহা তিনি অব্যর্থভাবে বুঝিতে পারিতেন। ভারতে এরূপ চির-সফল সুবিধাবাদী **unfailing opportunist** আর দেখা যায় না।

তাঁহার এই সুবিধার পন্থা দেখিয়া বাহির করিবার, রন্ধ্রে প্রহার করিবার দৈবশক্তি তাঁহার বিখ্যাত কর্ণাটক অভিযানে অতি উজ্জ্বলভাবে

প্রকাশ পাইয়াছে। মারাঠী বখর-কার এই সেনাচালনকে "ছত্রপতির দক্ষিণ দিগ্বিজয়" নাম দিয়াছেন, এবং একজন ইংরাজ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বণিকের বর্ণনায় আছে যে "জুলিয়াস্ সিজারের মত শিবাজী সেই প্রদেশে আসিলেন, দেখিলেন ও জয় করিলেন"; ইহাই তাহার যথার্থ বর্ণনা। কত রাজনৈতিক ফন্দি, সন্ধি পাতান, মুঘল সুবাদারকে ঘুষ দেওয়া, চর পাঠাইয়া সব খবর লওয়া, ঘাটিতে ঘাটিতে নিজ লোক আগে হইতে গোপনে প্রস্তুত রাখা, এই অভিযানের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া তবে শিবাজী একপদও অগ্রসর হন, এবং এইরূপ দূরদর্শিতার সহিত বন্দোবস্তের ফলে তাঁহার গতি যে কেমন অবাধ ছিল, কাজটা কত শীঘ্র সম্পন্ন হইল তাহা শিবাজী-চরিতের এই অধ্যায়ে আপনারা অনেকেই পড়িয়াছেন।

শত্রুরা শিবাজীকে লুঠিয়াই বলুক, আর পার্বত্য মূষিকই বলুক, তাঁহার সফলতা ও শক্তিকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। স্বয়ং আওরংজীব ১৬৬৭ সালে তাঁহার 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করেন এবং ১৬৭৪ সালে শিবাজী মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে নিজকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, নিজ নামে টাকা বাহির করিলেন, এবং সেইদিন হইতে এক রাজ্যাভিষেক শক প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহাই ত গেল তাঁহার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিবার পথের সোপানাবলী। তাহার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

তাঁহার শাসনপ্রণালী সে যুগের এবং সে দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, এবং ঐ দেশের পূর্ব সংস্কার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে গঠিত —বিদেশ হইতে কলে ঢালা দ্রব্যের আমদানী নয়—এজন্য উহা বেশ

সুফল প্রদান করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত টেঁকে। পরবর্তী রাজাদের চরিত্রহীনতার এবং মন্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়ার ফলেই এই শাসন-প্রণালী পরে ভাঙ্গিয়া পড়ে—পরিকল্পনার দোষে নহে। শিবাজীর রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতিতে অষ্টপ্রধানদের পদ ও কার্যবিভাগ আপনারা জানেন।

শিবাজীর নূতন সৃষ্টি—প্রায় আমাদের বিশ্বাসের অতীত—তাঁহার নৌসেনাগঠন। যখন তিনি কল্যাণ (বর্তমান থানা জেলা, বম্বে দ্বীপের ঠিক পূর্বে স্থিত স্থলভূমি) অধিকার করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ গড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া গোয়া ও দামনে পর্তুগীজদের ভয় জন্মিল। আপনারা শুনিয়া বিশ্বাস করিবেন না যে শিবাজী ও বম্বের ইংরাজদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে জলযুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইংরাজের পরাজয় হয়।

শিবাজীর সৈন্যগঠন ও নেতৃত্বের প্রশংসা করা অনাবশ্যক, কারণ মারাঠা শক্তির অদম্য বিকাশ এবং ভারতব্যাপী প্রভাবই ইহার সাক্ষ্য। এই সৈন্যগণকে শুধু বর্গী ভাবিলে ভুল হইবে। একজন উত্তর-ভারতীয় মুসলমান ঐতিহাসিক মারহাট্টা শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন "মার্‌কে হট্‌ গিয়া!" অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া দু চার ঘা মারিয়া দু চারটা জিনিষ লুঠ করিয়া, বিপক্ষ সৈন্য আসিতেছে শুনা মাত্র পলাইয়া যায়। কিন্তু শিবাজীর সময়ে মারাঠা সৈন্য ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর সামরিক শক্তি দেখায়। তাহারা মুঘল সেনাপতি ইখ্‌লাস খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে, অনেক দুর্গ প্রকাশ্যে অবরোধ করিয়া জয় করে, এবং প্রবল দল লইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সহস্রাধিক মাইল পথ কুচ করিয়া যায়। এগুলি লুঠিয়ার কাজ নহে।

শিবাজীর রাজ-সভা দেশের—শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমস্ত ভারতের—গুণী জ্ঞানী শিল্পী ভক্ত জনগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। তাঁহারই

অনুগ্রহে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম আবার আলোক দিতে আরম্ভ করিল। ইহাও লুঠিয়ার কাজ নহে।

সর্বশেষে এই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নরপতি সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি, সর্বধর্মের মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সম্মান, সর্বজাতির সাধু পুরুষদের আদর ও অর্থ এবং লাখরাজ জমি দান প্রভৃতি কাজের দ্বারা সেই যুগে এক অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছিলেন। সে দৃষ্টান্তের অভাব আজ জার্মানি অনুভব করিতেছে। শিবাজীর দর্শিত আদর্শকে ভুলিয়া যাইবার ফলে আজও ভারতে ধর্মের দোহাই দিয়া নরহত্যা ও গৃহদাহ চলিতেছে। তাই রামদাসের ভাষায় আজও বলা আবশ্যক—"শিবরাজাস্ আঠবাবে"—

'শিবাজীকে স্মরণ রাখিবে'।

শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা

আমি পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে গ্রান্ট ডফ্-রচিত এবং এতকাল সর্বত্র গৃহীত শিবাজীর ইতিহাস-কাহিনীতে গত ১৯ বৎসরে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র—শম্ভুজী ও রাজারামের ইতিহাসেও, আধুনিক গবেষণার ফলে ঠিক সেই পরিমাণে অতি মূল্যবান সংশোধন আমরা এখন করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রাপ্ত, কিন্তু ডফের অজ্ঞাত অথবা যৎসামান্য ব্যবহৃত, উপাদানগুলি এই :—

(১) শম্ভুজী কর্তৃক সাষ্টি (Salsette) আক্রমণের পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত অতি দীর্ঘ বিবরণ ; ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে।

(২) আওরংজীবের পুত্র কুমার আকবর বিদ্রোহী ও পলাতক হইয়া মারাঠা রাজার আশ্রয়ে থাকিবার সময় তাঁহার লিখিত ফার্সী পত্রগুলি (লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ের হস্তলিপি)।

(৩) এই আকবর ও গোয়ার কর্মচারীদের মধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয় তাহা এবং পোর্তুগীজ সরকারী দলিলাদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোয়া-নিবাসী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থর্লেকর অল্পদিন হইল ছাপাইয়াছেন।

(৪) পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর দিনলিপি ; ইহাতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্ণাটকের বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনটি বৃহৎ ভলুমে অল্পদিন হইল ইহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ঐতিহাসিক অর্মের নকল করা কতকগুলি খাতা। ইহাতে ইংরাজকুঠীর যে সকল কাগজ নকল করা হয় তাহার আসলগুলি অনেকস্থলে এখন লোপ পাইয়াছে। এই কাগজগুলি হইতে শম্ভুজীর রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত বিবরণ এখন রচনা করা যায়। গ্রাণ্ট ডফ্ যে চিটনিস বখরের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া এই দুই রাজার ইতিহাস লেখেন, তাহা অতি আধুনিক এবং প্রবাদমূলক, ১৮০৯ সালে রচিত। উপরের বর্ণিত উপকরণ হইতে ডফ এবং চিটনিসের অসংখ্য ভুল ঘটনা ও তারিখ সংশোধন করিয়া ঐ সময়কার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস গঠন করা এখন সম্ভব হইয়াছে। এই সংশোধনের ফল আমার ইংরাজী আওরংজীব গ্রন্থের চতুর্থ ভলুমে (দ্বিতীয় সংস্করণে) পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি।

(৬) আওরংজীবের যুগের সমসাময়িক ফার্সী হস্তলিখিত ইতিহাস ও পত্রাবলীর সাহায্যে রাজারামের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত ইতিহাস আমার আওরংজীব-গ্রন্থের পঞ্চম ভলুমে দিয়াছি। এই সব মালমসলা গ্রাণ্ট ডফের অজ্ঞাত ছিল, এবং এগুলির ব্যবহারের ফলে ১৬৮০ হইতে ১৭০০ এই বিশ বৎসরের মারাঠা ইতিহাস এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌছিয়া, মারাঠা ইতিহাসের অতি বহুল সংখ্যক এবং অমূল্য প্রাথমিক উপাদান আমরা গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে পাইয়াছি; ইহার সবই গ্রাণ্ট ডফের পরে আবিষ্কৃত। এগুলি মারাঠী সরকারী চিঠি, অথবা দূত ও সেনাপতিদের রিপোর্ট এবং নিজস্ব পত্র। দাক্ষিণাত্যের আজন্ম ইতিহাস-সেবক রাজবাড়ে, সানে, পারসনিস, খরে, সরদেশাই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রায় এক শত ভলুম ছাপিয়াছেন। তাহার পর, বম্বে গভর্ণমেণ্ট

নিজহস্তে স্থিত পেশোয়া-দপ্তরের সব কাগজপত্র খুঁজিয়া বাছিয়া ৪৫ ভলুম ঐতিহাসিক পত্র ও হিসাব, সরদেশাই মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সব উপকরণ মারাঠী ভাষায় লিখিত। এ ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অনেক অপ্রকাশিত ফারসী ইতিহাস এখন আমাদের হাতে আসায়, উত্তর-ভারত ও রাজপুতানায় মারাঠা জাতির ক্রিয়াকলাপ এবং পাণিপথের শেষ যুদ্ধের বিষয়ে অনেক অমূল্য সমসাময়িক বিবরণ নূতন জানা গিয়াছে এবং সেই যুগের ইতিহাস পূর্ণতর হইয়াছে।

অনেকেই জানিতে চান যে, এই পেশোয়া-দপ্তরের মত সমুদ্র মন্থন করিয়া, সাতাইশ হাজার বাণ্ডিলের প্রায় তিন কোটি কাগজখণ্ড ঘাঁটিয়া যে ৪৫ ভলুম-ব্যাপী চিঠিপত্র ছাপান হইল, তাহাতে মারাঠা ইতিহাসের নূতন কি কি তথ্য পাওয়া গেল। এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া কঠিন; ভারত ইতিহাসের এই শাখা যাহারা বিশেষ ভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাহাদের কতকটা বুঝান যায়। আমি সংক্ষেপে ইহার আভাস দিতেছি :—

পেশোয়া-দপ্তরে এবং সেখানে আনীত সাতারা-রাজাদের কাগজপত্র হইতে শিবাজী বা তাঁহার দুই পুত্রের সময়কার কোন ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় নাই ; দু চারিটা হুকুম বা স্থানীয় বিচারের রায় (মহজর-নামা) মাত্র মিলিয়াছে। সুতরাং ঐ দপ্তর পরীক্ষা আরম্ভ করিবার সময় যে একটি বড় আশা সকলের মনে জাগিয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। কিন্তু এই সব কাগজ হইতে পেশোয়া-যুগের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পযন্ত, মারাঠা ইতিহাস পূর্ণ ও নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট এতদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়

ছায়ার মত অস্পষ্ট ছিলেন; তাঁহার কার্যকলাপ, ক্রমোন্নতি এবং রাজার মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী আমাদের ভাল জানা ছিল না। এসব কথা আমরা পেশোয়াদপ্তরের কাগজ হইতে সদ্য জানিতে পারিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে, বালাজী প্রথমে নগণ্য লোক ছিলেন না, তাঁহার অভ্যুদয় যে সালে আরম্ভ হয় বলিয়া এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অনেক বৎসর আগেই তিনি স্বদেশের রাজকার্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন—সেনাকর্তা, জেলাশাসক প্রভৃতির কর্ম করিতে-ছিলেন। ক্রমে আরও বড় হইয়া, অবশেষে প্রধান মন্ত্রী মুখ্যপ্রধান এর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রতি অন্য মন্ত্রীদের বা সর্দারগণের ঈর্ষ্যা ও বাধা দিবার চেষ্টা এই নূতন কাগজ হইতে বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, দ্বিতীয় পেশোয়া বাজী রাও-এর উত্তর-ভারতে অভিযান, মালব-বিজয়, দিল্লীর দ্বার পর্যন্ত লুঠ, ভুপালের নিকট নিজামকে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি, যাহা এতদিন সংক্ষেপে জানা ছিল তাহার সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত, দিনের পর দিন তারিখযুক্ত কাহিনী এই দপ্তর হইতে উদ্ধার হইয়াছে ও তাহার সাহায্যে এতদিনকার প্রচলিত ভুল কথা ও মিথ্যা তারিখ এখন সংশোধন করা যায়।

এই ৪৫ ভলুম মারাঠী উপকরণ বিশেষভাবে পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এই পেশোয়াদের দপ্তর মারাঠা ইতিহাসের উপর যেমন নূতন আলোক পাত করে, দিল্লী সাম্রাজ্যের এবং নিজামের ইতিহাসের জন্যও তাহা অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নূতন সংবাদ দেয় না। ফলতঃ হায়দরাবাদের নিজামদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিমাণের আদিম ঐতিহাসিক উপকরণ এই মারাঠী ভাষায় লিখিত কাগজগুলিতে আছে—এত ফারসী ভাষায়ও নাই, নিজামের দপ্তরখানাতেও নাই।

১৭২৭ হইতে ১৭৬৯ পর্যন্ত বারম্বার নিজাম-পেশোয়া সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও সন্ধির, অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই মারাঠী কাগজ হইতেই রচনা করা সম্ভব।

সেই মত মাদ্রাজ কর্ণাটকে মারাঠাদের অভিযান,—যাহাতে ক্লাইভের অভ্যুদয় হইল, এবং যাহার এক তরফা অর্থাৎ ইংরাজপক্ষের উক্তি-মাত্র আমরা এতদিন জানিতাম,—তাহার সম্বন্ধে মারাঠা পক্ষের সাক্ষ্য এবং নূতন তথ্য এই দপ্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পোর্তুগীজ-পেশোয়া সংঘর্ষগুলিরও সেই মত মৌলিক বিস্তৃত মারাঠী চিঠিপত্র পাইয়া আজ আমরা এতদিন পর্যন্ত জ্ঞাত পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা ইতিহাসের ফাঁকগুলি পূরাইতে, ভুলগুলি সংশোধন করিতে পারিতেছি।

মারাঠা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক বিষয় হইতেছে ১৭৬১ সালের জানুয়ারি মাসে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী উত্তর ভারতীয় অভিযানগুলি। মারাঠী ভাষার কাগজপত্রে ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি যৎসামান্য নূতন খবর অধুনা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৭৫৪ হইতে ১৭৬০ সালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত, মারাঠা সৈন্যদের গতিবিধি, নেতাদের মন্ত্রণা ও নীতি পরিবর্ত্তন, অপরাপর শক্তিগুলির সহিত সন্ধি বিগ্রহ, দেশের দশা প্রভৃতি বিষয়ে অতি বিস্ময়জনক বিপুল নূতন খবর,—সবই সমসাময়িক ও লিখিত—আজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। এই কাজ আরম্ভ করেন বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, কয়েকটি মারাঠা ঐতিহাসিক পরিবারের দপ্তর মধ্যে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ১৮৯৮ সালে প্রথমখণ্ডে এবং ১৯০৭ সালে ষষ্ঠখণ্ডে ছাপিয়া। গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই নিজের সম্পাদিত "পেশোয়ার দপ্তর হইতে বাছা কাগজপত্র" ৪৫ ভলুমে এই কাজ সম্পূর্ণ বিস্তৃত এবং

সরকারী দলিলের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার পশ্চাতে মারাঠারাজদরবারের নীতি এবং এই সব অভিযানের ইতিহাস শুধু এই কাগজ হইতেই নূতন করিয়া লেখা সম্ভব।

তারাবাই ও আনন্দীবাই, অর্থাৎ ছত্রপতি রাজারাম এবং পেশোয়া রঘুনাথরাও দাদা, এই দুজনের স্ত্রী—অতি তুখোড় ফন্দিবাজ জঙ্গী নারী ছিলেন। তাঁহাদের অনেক বর্ষব্যাপী চিঠিপত্র আবিষ্কার হওয়ায় তাঁহাদের চরিত্র এবং সেই সেই যুগে রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরে কিরূপে কল চলিত, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব এখন জানা যায়। সরদেশাই সম্পাদিত আরও কয়েকটি ভলুমে পেশোয়াদের পারিবারিক জীবনের এবং সেকালকার সমাজের অতি উজ্জ্বল চিত্র পাইতেছি; ইহাও নূতন। সর্বশেষে, অনেকগুলি বিখ্যাত মারাঠা সরদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের বা প্রথম ২।৩ পুরুষের আদ্যন্ত বিবরণ এই দপ্তর হইতে সংকলন করিয়া প্রচলিত প্রবাদগুলি খণ্ডন করা গিয়াছে।

সুতরাং সকলে দেখিবেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত উপকরণগুলি কত মূল্যবান্, কত বিচিত্র, কত মনোরম। অন্য কোন প্রদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালে এমন সৌভাগ্যজনক আবিষ্কার ঘটে নাই, ঘটিবার আশাও নাই।

এই ত গেল মারাঠা ইতিহাসের নূতন মালমসলা। এখন শিবাজীর পর মারাঠা রাষ্ট্রের ঘটনাস্রোত পর্যবেক্ষণ করা যাউক। আমি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া বা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মত ইতিহাসের কঙ্কাল এখানে খাড়া করিয়া, আপনাদের বিরক্ত করিব না। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এই শিবাজীর পরবর্ত্তী ১৩৭ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন মারাঠা রাজ্যে ও রাজনীতিতে কি কি বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কোন্ কোন্

প্রভাবে ঘটনাগুলি সেই আকার ধারণ করিল, এবং জননেতাদের কি কি দোষগুণে মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি বা পতন হইল।

শিবাজীর মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাদশাহ নামে চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইলেন। মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় বন্দী, না হয় পলাতক ক্ষুদ্র জমিদারের মত কাল কাটাইতে লাগিলেন। শিবাজীর দুই পুত্র, শম্ভুজী ও রাজারাম, ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজারামের মৃত্যুর পর (১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে) মারাঠা ইতিহাসের শিব-পশ্চাৎ যুগের প্রথম অংশ, অর্থাৎ রাজাদের কাল, শেষ হইল, এবং সাত বৎসর ধরিয়া (১৭০০-১৭০৭, আওরংজীবের মৃত্যু পর্যন্ত) অরাজকতায় কাটিল। কারণ, শম্ভুজীর পুত্র শাহু তখন মুঘল শিবিরে বন্দী, কোলাপুরে তারাবাই নিজ পুত্রকে রাজা বলিতেন, কিন্তু বেশী লোক তাহাকে স্বীকার করিত না; কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দেশ হইতে নির্বাসিত, এই হইল সেই দেশের দশা। সত্য বটে, আওরংজীবের মৃত্যুর চারি মাস পরে শাহু খালাস পাইয়া নিজ দেশে ফিরিলেন এবং পিতা-পিতামহের রাজ্য দখল করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত অবাধ্য সামন্তগণ এবং ভাগী অংশীদার (পিতৃব্যপুত্র, কোলাপুরের রাজা)-র সহিত যুদ্ধ করিতে হইল।

অবশেষে ১৭১৩ সালে শাহু রাজা হইয়া বসিলেন (সাতারার ছত্রপতি বংশ)। কিন্তু এখন হইতে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হইল; কারণ, তাঁহার সিংহাসনের স্তম্ভ হইলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া। ছত্রপতি শাহু এই বিশ্বাসী এবং কার্যদক্ষ মন্ত্রীর সব হাতে শাসন কাজ ছাড়িয়া দিয়া, নিজে শুধু উপরে উপরে তত্ত্বাবধান এবং প্রধানদের মধ্যে ঝগড়া মিটান লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন।

মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া-যুগ অতি পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত; এই বিভাগের রেখা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের শেষ যুদ্ধ এবং তাহার অব্যবহিত পরে পেশোয়া বালাজী বাজী রাওএর মৃত্যু এবং তাঁহার নাবালক পুত্র মাধব রাওএর সিংহাসন-প্রাপ্তি। এই দুটি কাল-বিভাগের মধ্যে ঘটনাস্রোতে, নেতা-চরিত্রে এবং রাষ্ট্রনীতিতে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, এই সব পেশোয়ারা স্বার্থপর প্রভুদ্রোহী চাকর ছিল। কিন্তু এটা ভয়ানক ভুল। কারণ, বন্ধুবান্ধবহীন নবাগত শাহুকে সিংহাসনে স্থিরভাবে বসাইলেন, এবং এইরূপে নব-জীবনপ্রাপ্ত মারাঠা রাজশক্তিকে স্থায়ী এবং ভারতব্যাপী করিলেন পেশোয়ারা; এ কাজ শাহু করিতে পারিতেন না; আর পেশোয়ারা না উঠিলে মারাঠাজাতি কখনই গুজরাত মালব কর্ণাটক জয়, এবং দিল্লী পঞ্জাব বাঙ্গালা পর্যন্ত লুট করিতে পারিত না। কোলাপুরের রাজবংশের মত আর একটি স্থানীয় জমিদার সাতারায় স্থাপিত হইত মাত্র, এবং তাঁহার পক্ষে ছত্রপতি উপাধি হাসির বিষয় হইত।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কোন্ কোন্ বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজ প্রভুকে দেশের রাজা বলিয়া সকলের দ্বারা গৃহীত করিতে এবং স্থায়িভাবে সিংহাসনে বসাইতে আর কোলাপুরের রাজশাখাকে নীচে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার চরিত্রের গুণগুলি কত বিচিত্র এবং সাতারার রাজবংশের তিনি যে কত বেশী উপকারক ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৭০৭-১৭১২ সালে ঐ দেশ অরাজকতায় পূর্ণ, প্রত্যেক লোকই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কোন রাজাকে মানিতে বা কর দিতে অথবা স্বদেশের কাজে অন্যের সহিত মিলিতে সম্মত নহে। মুঘল-কারাগার হইতে প্রত্যাগত শাহুর না ছিল

অর্থ, না ছিল লোকবল। তাহার উপর, তারাবাইএর নানাপ্রকার চক্রান্ত ও আক্রমণ-চেষ্টা। রাজার জমি সব নানা সামন্ত, পূর্বকর্মচারী-দের পুত্রগণ, অথবা জবরদস্ত স্বার্থপর নূতন লোকে দখল করিয়া বসিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, শাহুর পক্ষের অন্যান্য কর্মচারিগণ, বিশেষত অষ্ট প্রধানদের অপর সাত জন, পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দী, তাঁহার প্রাধান্য মানিতে অসম্মত, সব কাজে তাঁহাকে অপদস্থ ও নিস্ফল করিতে ব্যগ্র। মারাঠা রাজ্যের সেনাপতি-উপাধিধারী "প্রধান" মারাঠা জাতের, তিনি ব্রাহ্মণ পেশোয়ার উপর হাড়ে হাড়ে চটা, এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পর্যন্ত অগ্রসর। এইরূপ রাজসভায় বালাজী বিশ্বনাথ যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁহারই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহ্ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সনদ দিয়া শাহুকে শিবাজীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সর্-দেশ-মুখীর অধিকার দান করেন। শাহুর অধীনে প্রথম প্রথম কোন বড় সেনাপতি ছিল না। বালাজীর পুত্র বাজী রাও (১৭২০-১৭৪০ পর্যন্ত পেশোয়া) এই অভাব পূর্ণ করিলেন। বাজী রাওএর অদ্ভুত সামরিক দক্ষতা এবং আজন্ম নেতৃত্বশক্তির ফলে মারাঠাদের রাজা এই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃতই ছত্রপতি হইলেন, মুঘল সাম্রাজ্য অন্ধকার করিয়া নানা প্রদেশে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন; আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত লোকে মারাঠা নামে কাঁপিতে লাগিল। এরূপ কার্য শিবাজীও করিতে পারেন নাই। ইহাই পেশোয়াদের স্মৃতিস্তম্ভ।

বাজী রাও ঘরের পাশে নিজামের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ ও পরে সন্ধি করিয়া, অদম্য তেজে উত্তর-ভারত ও পোর্তুগীজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন; রাজপুতানায় কর আদায়, মালব অধিকার, গুজরাত লুণ্ঠন

(এবং তাঁহার পুত্রের সময় সম্পূর্ণ দখল) এবং বুন্দেলখণ্ডে ভাগ বসান প্রভৃতি তাঁহার সফলতার চিহ্ন। মারাঠাদের এই রাষ্ট্রীয় বিস্তার তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজী রাওএর সময়ে (১৭৪০-১৭৬১) চরমে পৌঁছে, এবং সেই সময়ই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। প্রথমত রাষ্ট্রের প্রধান নেতা শুধু যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদা মন দেওয়ায় শাসন কার্যে অবহেলা হইতে লাগিল; প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া দাঁড়াইল; অবিচার, ঘুষ লওয়া, জনহিতকর কার্যে অবজ্ঞা, দেশের দৈন্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পেশোয়াদের দেনা এত বেশী হইয়া উঠিল যে, উত্তর-ভারত লুঠ করা ভিন্ন তাহা শোধ দিবার কোন পথ দেখা গেল না; অথচ উত্তর-ভারতে বৃহৎ অভিযান পাঠাইলে তাহার খরচেই সব আদায় করা কর এবং লুঠ করা ধন খাইয়া ফেলিত। এইরূপে যখন বাহ্যত মারাঠা শক্তি মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত সকলের মাথার উপর তাপ দিতেছিল, তখনই মারাঠা স্বরাজ্য প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য হইয়া জাতীয় ক্ষয়রোগের মৃত্যুবীজ নিজ দেহে পোষণ করিতে লাগিল। পাণিপথে পরাজয় এবং সেখানে যত বড় মারাঠা সরদার এবং অক্ষৌহিণী সৈন্যের মৃত্যু ইহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

তদপেক্ষা অধিকতর ভীষণ ধ্বংসের কারণ হইল পেশোয়া রাজবংশে এবং কর্মচারিমণ্ডলে নৈতিক অবনতি এবং অন্তঃকলহ। তরুণ পেশোয়া মাধব রাও বল্লালের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের সর্বপ্রকার অনিষ্টই করিলেন, জাতীয় সকল শত্রু (নিজাম, ইংরাজ প্রভৃতির) সহিত বারম্বার যোগ দিলেন। মাধব রাওএর অকালমৃত্যু (১৭৭২) এবং নারায়ণ রাওএর খুন (১৭৭৩) এত কাছাকাছি ঘটিয়া মারাঠা-রাজকে একেবারে বজ্রাহত করিল। সেই সুযোগে ইংরাজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যক্তি অপেক্ষা জাতি বা জনসমষ্টি অনেক শ্রেষ্ঠ; মারাঠাদের মধ্যে এই সঙ্ঘপ্রাণ, জাতীয় শক্তি এত অধিক ছিল

যে, "বারা ভাই" জুটিয়া এই মহাবিপদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বাঁচাইলেন; কুলাঙ্গার রঘুনাথকে পরাজিত করিয়া মাধব রাও নারায়ণের সিংহাসন বজায় রাখিলেন। এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সময় নানা ফড়্‌নবিস্‌ দেশের শাসনক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নিজগুণে অধিকার করিলেন, অর্থাৎ নাবালক পেশোয়ার রক্ষাকর্তা এবং পরে "পেশোয়ার পেশোয়া" হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষণ অপেক্ষা গঠনের শক্তি অনেক কম ছিল, ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি একেবারেই ছিল না; নানা মতের, নানা শ্রেণীর লোকদের মিলাইয়া মিশাইয়া আপোষে সমবেত চেষ্টায় দেশের জন্য বড় বড় কাজ করিবার যে আশ্চর্য শক্তি ইংরাজ জাতির আছে, নানা ফড়্‌নবিসের চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি সব কাজ নিজে করিতে চাহিতেন, সর্বত্রই স্বয়ং প্রভু, একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে চেষ্টা করিতেন।

এদিকে, এই শেষ যুগে মারাঠা শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র পুণা হইতে উত্তর-ভারতে সরিয়া আসিল, সিন্ধিয়া মালব, দিল্লী এবং রাজপুতানায় প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন, অথচ নানা ফড়্‌নবিস্‌ তাঁহার সহায়তা না করিয়া হিংসায় বাধা দিতে লাগিলেন। অপর প্রান্তে টীপু সুলতান অতি প্রবল হইয়া উঠায়, পুণার মারাঠারাজ ভীত, অনেকটা হতবীর্য হইয়া ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; অথচ কর্ণওয়ালিসের সময়ে অকপটভাবে ইংরাজের সহায়তা করিয়া টীপুকে নাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন। অতি-চালাক লোক নিজ চালাকির ফাঁদে পড়িয়া অবশেষে নিজেই মারা যায়। নানা ফড়্‌নবিসের বিফলতা এই সত্যই প্রমাণ করিতেছে।

তাঁহার মন্ত্রিত্বের শেষে পেশোয়ার অপঘাত মৃত্যু (কেহ বলে আত্মহত্যা), নচ্ছার রঘুনাথের ততোধিক অসার পুত্র দ্বিতীয় বাজী

রাওএর সিংহাসন প্রাপ্তি, সিন্ধিয়া-হোলকারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, এবং অবশেষে ইংরাজের দাসত্ব (১৮০২) এবং ইংরাজ কর্তৃক পেশোয়ারাজ্য জয় করা (১৮১৮) এ সব ঘটনা সকলেরই জানা ইতিহাস। এই সর্বশেষের ১৫ বৎসর (১৮০৩-১৮১৭) ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পেশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষসম এবং আমাদের পক্ষে অসীম লজ্জার ও শোকের বিষয়।

মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী

আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রচলিত ভাষাতেই যেমন একদিকে নবীন সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে, অন্য দিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাহিত্যের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা উদ্ধার করিবার, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রচার করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। ইহা ভিন্ন, যে প্রদেশের বা জাতির এক সময়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল, যাহার একটি স্বাধীন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রদেশ বা জাতির অতীত গৌরব ও পতনের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য প্রগাঢ় আগ্রহ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। জ্ঞানের এই শেষ দুই ক্ষেত্রে বঙ্গের বাহিরে কোনও প্রদেশই মহারাষ্ট্রের সমান অগ্রসর হইতে পারে নাই, এত মহার্ঘ কাব্য-ইতিহাসের সম্পদ্ সংগ্রহ করিতে পারে নাই; আর, কোনও প্রদেশেই এরূপ সর্ব-জন-ব্যাপক ও অফুরন্ত উদ্যম এবং ইতিহাসের প্রকৃত মৌলিক উপকরণ প্রকাশে এত বেশী সফলতা দেখা যায় না। সেই মহারাষ্ট্র প্রদেশে ২৭ বৎসর ধরিয়া অনেকবার ভ্রমণ করিয়া এবং তাহার ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার একটি দিক আজ আপনাদের দেখাইব।

মারাঠী ভাষায় কাব্যসাহিত্য, আমাদের বঙ্গীয় প্রাচীনতম বৈষ্ণব সাহিত্যেরও আগে হইতে পাওয়া যায়। এই সব কবিরা সাধু সন্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁদের গ্রন্থগুলি রস অপেক্ষা ধর্ম ও নীতির হিসাবে অধিক মূল্যবান ও প্রভাবময়। সুতরাং সমাজ ও জাতির ইতিহাসের

পক্ষে এগুলি অমূল্য উপাদান। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর ধর্মশিক্ষাকে "প্রকৃত কর্মযোগ" বা "ফলিত ভগবদ্‌গীতা" বলা হয়—ইহাই তাহার যথার্থ বর্ণনা। আর, বড় বড় কবি ছাড়া তাঁহাদের অনুবর্তী যে শত শত কম-খ্যাত কবি মধ্যযুগে মহারাষ্ট্রদেশ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাদের লেখার পনের আনাই অপ্রকাশিত,—অনেক স্থলে অজ্ঞাত। কিন্তু গত চল্লিশ বৎসরের অক্লান্ত দেশব্যাপী চেষ্টার ফলে নানাপ্রকার পুরান কাগজ ঘাঁটিবার সময় এগুলি দু এক পাতা করিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে; এবং এইরূপে একটি বিশাল সাহিত্য আমাদের চোখের সামনেই বিস্মৃতির অতল হইতে মাথা তুলিতেছে। মারাঠা দেশ শুষ্ক প্রস্তরময়, বাঙ্গলার মত বন্যা, ভেজা বাতাস ও উই পোকার অধীন নহে। এ জন্য সেখানে কাগজের নাশের ভয় অত্যন্ত কম। আজ এই কাব্যগুলির কথা বলিবার মত সময় নাই। মারাঠা ইতিহাসের উপাদান ও সেবকগণের কথা মাত্র আপনাদের নিকট বিবৃত করিব।

বঙ্গদেশের মতই, মারাঠা ইতিহাসের চর্চা ও রচনায় একটি যুগান্তরসদৃশ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার তিনটি স্তর বা যুগ অতি পরিষ্কার ভাবে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়। প্রথমে কি ছিল, তাহা লইয়াই আরম্ভ করি। ইংরাজী শিক্ষা পাইবার আগে মহারাষ্ট্রে ইতিহাস নামে যাহা চলিত ছিল, সেগুলি দুই শ্রেণীর গ্রন্থ—(১) রাজা ও রাজন্য ঘরের নিযুক্ত মুন্সী (চিট্‌নিস) দের রচিত কাহিনী। এগুলির মধ্যে কতক সত্য তথ্য থাকিলেও অধিক অংশই প্রচলিত গল্পে পূর্ণ। মুঘল পাদশাহদের সভায় রচিত আকবরনামা, পাদিশাহনামা, আলমগীরনামা প্রভৃতি ফার্সী ইতিহাসগুলি যেমন একমাত্র সরকারী শেরেস্তার কাগজপত্র এবং ঐতিহাসিক পুরুষগণের প্রত্যক্ষ কাহিনীর উপর নির্ভর

করিয়া লেখা, এই বখরগুলি সেরূপ নহে, একেবারে সে শ্রেণীর বাহিরে। তাই এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এগুলিকে গুজবপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"gossiping bakhars"। আবার প্রচলিত অনেকগুলি বখর, ঘটনার এত পরে লিখিত এবং এত হাস্যাস্পদ ভুলে পূর্ণ যে, তাহা দেখামাত্র ত্যাগ করিতে হয়।

(২) বংশকাহিনী। এগুলি রাজন্য, জমিদার ও জাগীরদারগণ নিজ বংশের স্বত্ব স্থাপন বা কুলগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য পেশোয়া সরকার অথবা ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইংরেজ কর্মচারীদের সামনে পেশ করেন। ইহার ভিতর আট আনা কিম্বদন্তী, আর আট আনা সত্য ঘটনা বলিলে অন্যায় হয় না। এগুলির মারাঠী ভাষায় নাম—অমুকের "হকিকত, কৈফিয়ৎ, ইয়াদি বা করিনা"।

ইহা ভিন্ন সে যুগে ছিল,—(৩) ইতিহাসের কংকাল অর্থাৎ শকাবলী। এই শ্রেণীর "জেধে যাঁচি শকাবলী" শিবাজীকাল সম্বন্ধে অমূল্য।

(৪) সরকারী জমাখরচের খাতা ও ডায়েরী। এগুলি সত্য, কিন্তু অতীতের একটি দিক্ মাত্র স্পর্শ করে।

ফলত ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সরকারী কাগজপত্র, যাহাকে ষ্টেট্‌পেপার ও ডেস্‌প্যাচ বলা হয়, তাহা ঐ প্রথম যুগে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা তখন অজ্ঞাতবাস করিতেছিল।

সহস্র সহস্র ব্যক্তির বংশ বা মঠ সম্বন্ধে মারাঠা-রাজের দানপত্র, দায়ভাগ (নিবাড়পত্র), এবং জুরীর মীমাংসা (মহজরনামা) এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে এবং অনেকাংশে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এগুলি ব্যক্তিগত দলিল মাত্র (private legal deeds); ইহাতে তারিখ ও সমাজের অবস্থা ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

ইংরাজসংস্পর্শে আসিবার পর, কিন্তু মারাঠারাজ অবসান হইবার পূর্ব পর্যন্ত (ধরুন ১৭৬৫—১৮১৭ খৃঃ) ফরাসীনবিস হিন্দু মুন্সীরা সাহেবদের জন্য মারাঠা ইতিহাস মারাঠী ভাষায় সংকলন করেন এবং তাহার অনেকগুলির ফার্সীতে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচিত হয় *। অনেক প্রসিদ্ধ ফার্সী ইতিহাস মারাঠাদের সম্বন্ধে অধ্যায়গুলিতে এই উপকরণ ব্যবহার করিয়াছে,—যেমন প্রথম যুগের ইংরাজদের সম্বল খাজানা-এ-আমারা, সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খরীন, মাসির-এ-আসফী প্রভৃতি। এই শ্রেণীর সর্ব শেষ গ্রন্থ মলহার রামরাও চিট্‌নিস রচিত বখর ১৮১০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। আর, মারাঠী ভাষায় রচিত তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির-গাত্রে প্রস্তরে (১৮০৩) খোদা অতি দীর্ঘ শিলালেখ। দুইটিই সমান অসার।

দ্বিতীয় যুগ, গ্রাণ্ট ডফের রাজত্ব, ১৮১৮—১৮৬৮ খৃঃ। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতারার ছত্রপতি এবং পুণার পেশোয়াগণের সমস্ত দপ্তর এবং অনেক পুরাতন রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত বংশের কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পান, এবং অনেক বর্ষব্যাপী শ্রমের পর তাঁহার মারাঠা ইতিহাস তিন ভলুমে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের প্রথম তৃতীয়াংশ অর্থাৎ শিবাজীর বংশ (১৬২৪—১৭০৭ পর্যন্ত) তাঁহার অজ্ঞাত অসংখ্য নূতন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে এখন বাতিল হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ পূর্ব-পেশোয়া যুগ, ১৭০৭—১৭৬১, প্রায় আট আনা খাড়া রহিয়াছে, অপর অর্দ্ধেক নূতন মারাঠী ও ফার্সী

* যথা, (১) মালকরে বখর (ফার্সীর নাম তারিখ-ই-শিবাজী, আমি ইংরাজীতে ভাষান্তর করিয়াছি। (২) নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টনের জন্য ১৭৯৪ খৃঃ গুলাল রায় কর্তৃক রচিত উহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রন্থ, (৩) সার চার্লস্‌ ম্যালেটের জন্য সংগৃহীত ও অধ্যায়ে ইতিহাস, ১৭০০ পর্যন্ত।

কাগজপত্রের আলোকে পরিহর্তব্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শেষ তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উত্তর-পেশোয়া যুগ, ১৭৬১—১৮১৭, সম্বন্ধে ডফ্ এখনও অদ্বিতীয় রহিয়াছেন।

মারাঠা ইতিহাসের তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইল—বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাশ করা গ্রাজুয়েটদের স্বদেশপ্রেম ও জ্ঞানপিপাসার ফলে। যেমন আমাদের বঙ্গদেশে ঠিক সেই শ্রেণীর গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র, সাহেবদের লেখা বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া প্রথম প্রকাশ্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন, সেই মত মহারাষ্ট্রে নীলকণ্ঠজনার্দন কীর্ত্তনে (প্রায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) গ্রাণ্ট ডফের মারাঠা ইতিহাসের উপর সন্দেহ ও দোষারোপ করিয়া তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই আক্রমণে জ্ঞান অপেক্ষা রাগই বেশী ছিল; যথা, তাঁহারা বলেন যে, ডফ্ সাহেব বইখানি শেষ করিবার পর তাঁহার সমস্ত আদি উপাদানগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন—পাছে কেহ তাঁহার ভুলগুলি ধরিয়া সংশোধন করে!

যাহা হউক, এই আবেগের ফলে মহারাষ্ট্রে নব্যশিক্ষিত সমাজে দেশের প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ উদ্ধার করিবার জন্য এক অনির্বচনীয় চেষ্টা জাগিয়া উঠিল। তাহার প্রথম প্রমাণ, "কাব্যেতিহাস সংগ্রহ" নামে একখানি সাময়িক পত্র বাহির হইল, এবং যে কয় বৎসর উহা বাঁচিয়া ছিল, তাহার মধ্যে উহাতে অনেকগুলি সংস্কৃত মারাঠী ঐতিহাসিক কাব্য, বখর, এমন কি, চারিশতের অধিক ঐতিহাসিক পত্র প্রকাশিত হইল। চারিদিকে আদি ও অকৃত্রিম সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাগজপত্রের খোঁজ চলিতে লাগিল এবং উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার চারি বৎসর পূর্ব হইতে এগুলি ছাপিবার জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। পারসনিস "ভারতবর্ষ" (দুই বৎসর চলিয়াছিল) এবং "ইতিহাসসংগ্রহ" (৭ বৎসর পরে লোপ পায়) নামক দুইটি মাসিক ক্রমান্বয়ে এই উদ্দেশ্যে

বাহির করেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পুণায় "ভারত-ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডল" স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ঠিক আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মতই, শুধু ভাষাতত্ত্ব অপেক্ষা ইতিহাস ইহার মুখ্য লক্ষ্য। মারাঠী ভাষায় "সংশোধন" শব্দের অর্থ অনুসন্ধান অর্থাৎ রিসার্চ।

"কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ" নামক মাসিকের যুগ্ম-সম্পাদক কাশীনাথ নারায়ণ সানে অনেকগুলি বখর ও ঐতিহাসিক চিঠি প্রকাশ করেন। ঐ দেশে তিনিই প্রথম দীর্ঘ-পরিশ্রমী ও কীর্তিবহুল ইতিহাস-সেবক। কিন্তু পুরাতন কাগজপত্র এবং অন্যান্য সাহিত্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বাহির করিবার কাজ বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ের জীবনব্রত ছিল; স্বদেশ ও স্বজাতির এই সেবায় তিনি চিরকৌমার্য এবং দারিদ্র্য বরণ করিয়া লন। আজ তাঁহার স্মৃতি মহারাষ্ট্রে লোকপূজ্য ও অমর হইয়া আছে, সুদূরবাসী ইতিহাস-পাঠকের চিরকৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। মারাঠা ইতিহাসের আসল চিঠিপত্র এবং সরকারী কাগজের খোঁজে তিনি আটক হইতে তাঞ্জোর পর্যন্ত বড় শহরগুলিতে এবং অসংখ্য গ্রামে গিয়াছিলেন—প্রায় সর্ব্বত্রই পদব্রজে। এই জ্ঞানযোগের জন্য তিনি সন্ন্যাসীর মত আহার ও শয়নের কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। "মারাঠাদের ইতিহাসের সাধনগুলি" নামক ২১ ভলুম তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান; তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অনেক প্রবন্ধ ও পত্রসংগ্রহ আছে।

প্রথমে গোদাবরী-তীরস্থ পেঠন নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে এক মুদীর দোকানে মশলা-বান্ধা কাগজের মধ্যে তিনি ২১ খানি পাণিপথ-যুদ্ধকালীন পত্র আবিষ্কার করেন, আর ঐ সময়ে হত গোবিন্দ পন্থ বুন্দেলের এক কর্মচারীর বংশধরের নিকট ঐ বিষয়ে ১৮২ খানি পত্র দেখিতে পান। এগুলির সহিত আরও দুই তিন স্থানের সংগ্রহ মিলাইয়া, ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁহার "সাধনেঁ"র প্রথম ভলুম বাহির

করিলেন (৩০৪ খানি পত্র, সময় ১৭৫০ –১৭৬১ খৃঃ) ; ইহা অমূল্য ঐতিহাসিক উপকরণ বলিয়া চিরদিন গণ্য হইবে।

এই দৃষ্টান্তে দেশময় একটা সাড়া ও অনুসন্ধানের উদ্যম দ্বিগুণ বেগে সঞ্চারিত হইল। বাসুদেব বামন খরে মিরজ-শহরে বসিয়া, নিকটবর্তী সাংগলীর পটবর্দ্ধন রাজার দপ্তরের বহু সহস্র ঐতিহাসিক পত্র সযত্নে সুসজ্জিত করিয়া, "ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহ" নামে ১৮৯৭ সাল হইতে ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ১৪ ভলুম বাহির হইয়াছে, এবং পাণিপথের যুদ্ধ হইতে ১৮০৪ জুলাই মাস পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনিসও বহু মূল্যবান্ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে। আবিষ্কারকর্তা হিসাবে বিশ্বনাথ রাজবাড়ে অতুলনীয় ও অমরকীর্তি।

এ পর্যন্ত যে সব পত্রের কথা বলিলাম, তাহার প্রায় সবগুলিই মারাঠা রাজ্যের স্থানীয় কর্মচারীদের জন্য প্রেরিত, পেশোয়া অথবা তাঁহার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিকট প্রেরিত অর্থাৎ সরকারী রিপোর্ট ও ডেস্‌প্যাচ নহে ; সুতরাং এগুলি ঘটনার এক দিক্ মাত্র আলোকিত করে। এখন সকলেই জানিতে চাহিলেন যে, পেশোয়াদের দপ্তর কোথায় গেল? সৌভাগ্যক্রমে পেশোয়াদের শতাব্দী-ব্যাপী অধিকারের সময় তাঁহাদের নিকট যে লক্ষাধিক পত্র পৌছে এবং যে হিসাবের খাতা ও ডায়েরী লেখা হয়, তাহা পেশোয়া রাজত্ব ধ্বংস হইবার পর (১৮১৮) ইংরাজরাজ জপ্ত করিয়া একটি অফিসে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার নাম "পেশোয়া দপ্তর" ও বাড়ীটির নাম "এলিএনেশন অফিস" পুণা। এখানে মারাঠী ভাষায় ২৭ হাজার বাণ্ডিল কাগজ আছে অর্থাৎ খারোয়া দিয়া জড়ান বোচ্‌কা। প্রতি বাণ্ডিলে এক বা দেড় হাজার পর্যন্ত পৃথক কাগজ ও দলিল। এগুলির মধ্যে শিবাজী বা তাঁহার পুত্রগণের রাজ্যকালের

(১৬৪০-১৭০০) কোন সরকারী কাগজ নাই, আছে শুধু পেশোয়াদের প্রতিপত্তির সময়ের (১৭০৭-১৮১৮)। সাতারা-রাজার দপ্তরে শিবাজীর পৌত্র শাহুরাজার সময়ের কিছু চিঠি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন পেশোয়ারাই রাজশক্তির আধার ও কেন্দ্র হইয়াছেন।

পেশোয়া দপ্তরের মারাঠী কাগজগুলি প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের অভ্যুদয় হইতে পঞ্চম পেশোয়া নারায়ণ রাওএর হত্যা (১৭৭৩) পর্যন্ত অতি বিপুল আকারে এবং ধারাবাহিকরূপে পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে কাগজপত্র এই ভাণ্ডারে যেন হঠাৎ লোপ পাইয়াছে। নারায়ণরাওএর পর তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ দাদার সহিত বারাভাইদের সুদীর্ঘ ঘরোয়া বিবাদ এবং সেই সুযোগে ইংরাজ কর্তৃক প্রথম মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, ১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ পর্যন্ত পুণার রাজশক্তি ওলট্ পালট্ ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেজন্য পেশোয়া দপ্তরে প্রাপ্ত ১৭৭৪ হইতে ১৮১৮ পর্যন্ত ৪৫ বৎসরের ঐতিহাসিক কাগজ কুড়াইয়া সবে তিনখানি ছোট ছোট সংগ্রহ গঠন করিতে পারা গিয়াছে। নাম— বারাভাইদের কাজ, প্রথম মারাঠা যুদ্ধ ও পেশোয়াই-এর শেষ যুগ।

তবে, এই শেষ যুগের সরকারী কাগজ কোথায় গেল? এগুলি লোপ পায় নাই, অন্যত্র ছিল। ১৭৭৭ হইতে ১৭৯৭ পর্যন্ত নানা ফড়নবিস পুণায় সর্বেসর্বা ছিলেন সমস্ত রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র পেশোয়া সরকারে পৌছিলে, তাহা প্রথমে তাঁহার হাতে আসিত এবং কাজের সুবিধার জন্য তাঁহার বাড়ীতে জমা থাকিত। পরে সেগুলি তিনি তাঁহার মেণ্‌ওয়ালী গ্রামস্থ বাটীতে পার করেন। সেখানে এগুলি এক শতাব্দীরও অধিক কাল পড়িয়া ছিল। রাজবাড়ে ঐ গ্রামে গিয়া এগুলি আবিষ্কার করেন—পড়িয়া, বাছিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাহার পর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনিস উহা হস্তগত করিয়া, অধিকাংশই

তাঁহার "ইতিহাসসংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রে এবং গোয়ালিয়র দরবারের খরচে ছাপা (কিন্তু সাধারণের পক্ষে অপ্রাপ্য) পাঁচ ভলুমে প্রকাশিত করেন। বাকী বাণ্ডিলগুলি এখন সাতারা মিউজিয়মে আশ্রয় পাইয়াছে, এবং তাহা হইতে বাছিয়া ২৩২ পৃষ্ঠার এক ঐতিহাসিক পত্রসংগ্রহ গত নবেম্বর মাসে ছাপা হইয়াছে।

আর ১৭৮৬ সালে পুণায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিবার পর হইতে পেশোয়া দরবারের এবং সমস্ত মারাঠা রাজ্যগুলির—এমন কি, তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিল্লী দরবার, রাজপুত রাজ্যগুলি, নিজাম ও টিপু স্থলতান সম্বন্ধেও অতি বিস্তৃত এবং সঠিক খবর রেসিডেণ্টের অফিসের হস্তলিখিত ইংরাজী কাগজ পত্রে, একশত কয়েকখানি ভলুমে আবদ্ধ আছে। এই ইংরাজী ষ্টেট্‌পেপার ও রিপোর্টগুলি দিয়া ১৭৮৬ হইতে ১৮১৮ পর্যন্ত মারাঠীভাষার সরকারী কাগজের অভাব পূরণ করা যায়; এগুলি ঠিক পেশোয়া-দপ্তরের পরেই বসে।

পেশোয়া-দপ্তরের মারাঠী ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক পত্র ও হিসাবের কাগজ বাছিয়া, ৪৫ ভলুমে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়া গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই নিজ দেশের ইতিহাসের স্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় পুণা রেসিডেন্সি রেকর্ডগুলি আমার তত্ত্বাবধানে বম্বে গবর্ণমেণ্ট ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা শেষ হইতে পঁচিশ ত্রিশটি বড় বড় ভলুম লাগিবে। কারণ, এ উপকরণ প্রচুর এবং বহু প্রদেশ-সংক্রান্ত।

মারাঠা ইতিহাসের উপর সমসাময়িক আলোক পাত করে, এরূপ পর্তুগীজ ভাষার কাগজপত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়া, পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থর্লে-কর (গোয়ানিবাসী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ) জাতীয় ইতিহাসের এক অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতেছেন।

এখন ফার্সী ভাষায় রচিত উপাদানগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশ মাত্র বাকী আছে। এ কাজটি বড় শ্রম ও ব্যয়সাধ্য। কারণ, এই শ্রেণীর উপকরণগুলি মারাঠা দেশে নাই, অধিকাংশ হস্তলিপিই সমগ্র ভারতেও নাই; তাহার জন্য লণ্ডন, অক্স্‌ফোড, এমন কি, বার্লিনের পুস্তকাগারে যাইতে হয়।
